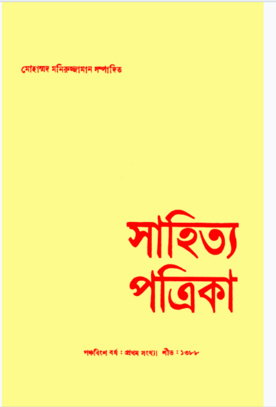

Vol. 25 | No. 1 | 1981

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

মৃগাবতী : পুথি পরিচিতি

Volume	25
Issue	1
Year	1981
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	মোহাম্মদ আবদুল আউয়াল
Published online	December 1, 1981
DOI	10.62328/sp.v25i1.7
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v25i1.7
Pages	128-139
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

মৃগাবতী : পুথিপরিচিতি

মোহাম্মদ আবদুল আউয়াল

মধ্যযুগের একটি উল্লেখযোগ্য রোমান্স বা প্রণয়োপাখ্যান হচ্ছে 'মৃগাবতী', কিন্তু বাঙলা সাহিত্যের আধুনিক পাঠকদের কাছে এই গ্রন্থ অতি অল্প পরিচিত। বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস গ্রন্থে এই পুথির উল্লেখ পর্যন্ত অনেক ঐতিহাসিকও করেননি। কোন কোন গ্রন্থে অবশ্য 'মৃগাবতী' কাব্যের উল্লেখ দৃষ্ট হয়, কিন্তু সেক্ষেত্রেও এই কাব্য-টির কোন বিবরণ তাঁরা দেননি। এ কাব্যটির মূলে ছিল হিন্দিতে রচিত কুতবনের 'মৃগাবতী'। কেউ কেউ হিন্দী কাব্যের বিবরণ দিয়েছেন। বাঙলা কাব্যের বিবরণ কেউ দেন নি। এর কারণ এই হতে পারে যে কাব্যটির বাঙলা অনুবাদের পাণ্ডুলিপি দুষ্প্রাপ্য। আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ সম্পাদিত পুথিপরিচিতিতে এ গ্রন্থের কোন উল্লেখ নেই। ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক[১] এই কাব্যের কোন পুথি সংগ্রহ করতে পেরেছেন কিনা জানি না। ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ অবশ্য তাঁর একটি গ্রন্থে[২] এই কাব্যের কিঞ্চিৎ বিবরণ দিয়েছেন, কিন্তু তিনিও ডক্টর মমতাজুর রহমান তরফদার[৩] কর্তৃক সংগৃহীত বিবরণের উপর ভিত্তি করেই তাঁর আলোচনা লিপিবদ্ধ করেছেন। ডক্টর সুকুমার সেন তাঁর 'ইসলামী বাংলা সাহিত্যে' মৃগাবতীর লেখক হিসাবে করিমউল্লা ও মুহম্মদ খাতেরের নামের উল্লেখ করেছেন।[৪]

আমার সংগ্রহে চট্টগ্রাম থেকে প্রাপ্ত 'মৃগাবতীর' একটি পাণ্ডুলিপি আছে। পুথিটির প্রথম দুটি পাতা নেই। অবশ্য এতে কাব্য পাঠে বেশী অসুবিধা হবেনা। ১০০ পাতায় পুথিটি সমাপ্ত। একই পুথিতে গ্রথিত রয়েছে 'সুলতান জমজমা' নামক আর একটি পুথির পাণ্ডুলিপি। পুথির পাতা প্রস্থে ৬$\frac{১}{২}$ ইঞ্চি এবং দৈর্ঘে ১১ ইঞ্চি। তুলোট কাগজে লেখা। পুথির কাগজ ও অক্ষরের ছাঁদ মনে হয় পুথিটি কম করে হলেও দুশো থেকে আড়াই শ' বছর আগের রচনা। অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি (১৭৫০) পুথির হওয়া সম্ভব।

আলোচ্য পুথির রচয়িতা করমুল্লা (করমউল্লাহ)। ডক্টর সুকুমার সেন তাঁর 'ইসলামী বাংলা সাহিত্য' গ্রন্থে করিমউল্লা নামে একজন লেখকের কথা বলেছেন। সম্ভবতঃ করিমউল্লা ও করমউল্লাহ একই ব্যক্তি। করমউল্লা চট্টগ্রাম জেলার সীতাকুণ্ড থানার মুরাদপুর গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। তাঁর গুরু বা পীরের নাম রমজালি। পীরের আদেশেই তিনি এই গ্রন্থ রচনা করেন।

মধ্যযুগের অন্যান্য অনেক কাব্যের মত 'মৃগাবতী' অন্য ভাষা থেকে অনুবাদ বা রূপান্তর। হিন্দীতে কুতবন 'মৃগাবতী' করেছিলেন। ১৪৯৪ খ্রীষ্টাব্দে হোসেন শাহ শর্কী জৌনপুর থেকে পালিয়ে গৌড়ে আশ্রয় নেন। তখন আলাউদ্দিন হোসেন শাহ গৌড়েশ্বর। কুতবন হোসেন শাহ শর্কীর সভাকবি ছিলেন। তিনিও হোসেন শাহ শর্কীর সঙ্গে পালিয়ে আসেন। হোসেন শাহ শর্কীকে ভাগলপুরের কাছে 'কোলভ' এ থাকার ব্যবস্থা করা হয়। সম্ভবতঃ এখানে বসেই কুতবন হিন্দীতে 'মৃগাবতী' কাব্যখানি রচনা করেন।

৯০৯ হিজরীতে (১৫০৩ খ্রীষ্টাব্দ) গুজরাট বা রাজপুতানার প্রচলিত কোন লোককাহিনী থেকে কুতবন সম্ভবতঃ এ কাহিনী সংগ্রহ করেছিলেন। ফারসী কবি নিজামীর 'হফ্‌ত পয়কর' এর কাহিনীর সঙ্গে 'মৃগাবতী'র কাহিনীর কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়।[৬] কুতবন রচিত 'মৃগাবতী'র কাহিনী-সারাংশ এরূপ :

চন্দ্রগড়ের যুবরাজ রাজকুমার একদা বনে হরিণ শিকার করতে যান। সেখানে তিনি একটি সুন্দর মৃগ দেখে মুগ্ধ হন। প্রকৃত পক্ষে ঐ মৃগটি ছিল কাঞ্চন নগরের রাজা রূপকুমারের কন্যা মৃগাবতী। ঐ মৃগের খোঁজে রাজকুমার এক সরোবর তীরে এসে উপস্থিত হলো, সরোবর তীরেই রাজকুমার ভবন নির্মাণ করে বসবাস করতে থাকে। একদিন রাজকুমার দেখল সাতটি পরীর মত সুন্দরী কন্যা সরোবরের জলে স্নান করছে। সবচাইতে সুন্দরী কন্যাটি ছিল মৃগাবতী। রাজকুমার তীরে রাখা মৃগাবতীর বস্ত্রহরণ করেন। বস্ত্রের প্রলোভন দেখিয়ে রাজকুমার মৃগাবতীকে তার বাসস্থানে নিয়ে আসে। কিছুকাল এক সঙ্গে থাকার পর মৃগাবতী একদিন সুযোগ বুঝে পালিয়ে যায়। রাজকুমার তখন যোগীবেশে মৃগাবতীর অনুসন্ধানে বেরিয়ে পড়েন। কাঞ্চন নগরের পথে রাজকুমার দৈত্যের কবল থেকে 'রুকমিনী'কে উদ্ধার করে এবং শেষে তাকে বিয়ে করেন। কিন্তু রাজকুমারের মন অচিরেই চঞ্চল হয়ে উঠল। অনেক কষ্টের পর রাজকুমার পৌঁছল কাঞ্চন নগরে। মৃগাবতীকে ফিরে পেয়ে রাজকুমার শান্ত হলেন।

এদিকে চন্দ্রগড়ের রাজা তাঁর হারানো রাজপুত্রের সন্ধানের জন্য দিকে দিকে চর পাঠাতে থাকে। কাঞ্চন নগরে এসে তারা রাজকুমারের সন্ধান পায়। তখন দুই স্ত্রী সহ রাজকুমার স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন এবং সুখে দিন অতিবাহিত করেন। দুর্ভাগ্য ক্রমে রাজকুমার এক দুর্ঘটনায় মৃত্যু বরণ করেন ; সঙ্গে সঙ্গে তার দুই স্ত্রী সহমৃতা হয়।[৭]

মালিক মুহম্মদ জায়সীর 'পদুমাবৎ' কাব্যের সঙ্গে 'মৃগাবতীর' সাদৃশ্য লক্ষ্য করে এমন সিদ্ধান্ত করা চলে যে জায়সী কুতবনকে অনুসরণ করেছিলেন—আলাওলের 'পদ্মাবতী'তে কুতবনের উল্লেখ আছে।[৮]

হিন্দীতে মেঘরাজ রচিত একটি মৃগাবতীর কাহিনী পাওয়া যায়।[৯] তার কাহিনী সংক্ষেপে নিম্নরূপ :

কর্ণাটকের রাজপুত্রের হরিণ শিকারের সখ ছিল। কিন্তু রাজা তাকে পূর্বদিকে হরিণ শিকার না করতে বলেছিলেন কিন্তু যুবক রাজকুমার পিতার আদেশ উপেক্ষা করে পূর্বদিকে বেরিয়ে পড়লো। পথে এক সোনার হরিণীকে দেখতে পেয়ে তাকে ধরার জন্যে ছুটতে ছুটতে এক সরোবর তীরে গিয়ে দাঁড়ালো। তারপর সে হরিণী সরোবরে ডুবে গেল। কুমার সে সরোবরতীরে বাস করতে থাকে। রাজা কুমারকে ফিরিয়ে নিতে এসে ব্যর্থ হলো। রাজা জ্যোতিষদের সঙ্গে আলোচনাক্রমে জানতে পারলেন যে হরিণী হচ্ছে ইন্দ্রের সভার নর্তকী। ইন্দ্রের অভিশাপে সে 'মৃগ' রূপ ধারণ করেছে। শুধু একাদশীর দিন সে স্ত্রীরূপ ফিরে পায়। এবং অন্যান্য অপ্সরীদের সঙ্গে জলক্রীড়া করতে থাকে। জলক্রীড়ার সময় তীরে তারা তাদের বস্ত্র রেখে জলে নামে। রাজকুমার এক সুযোগে হরিণীর বস্ত্র লুকিয়ে রাখে। মৃগাবতী জলক্রীড়া করে তীরে উঠে দেখে যে তার বস্ত্র নাই ; তখন সে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে। অবশেষে রাজকুমারের প্রস্তাবে সম্মত হয় এবং তাকে স্বামীত্বে বরণ করে। একদিন এক সুযোগে মৃগাবতী তার নিজের বস্ত্র উদ্ধার করে পালিয়ে যায়। রাজকুমারের পরিচারিকার কাছে মৃগাবতী তার ঠিকানা—কাঞ্চনপুর বলে যায়।

রাজকুমার ইন্দ্রজিৎ কাঞ্চনপুরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলো। পথে এক নগরে গিয়ে শুনলো যে এক দৈত্য প্রতিদিন একটি করে মানুষ ভক্ষণ করে। সেদিন ছিল রাজার মেয়ের পালা। ইন্দ্রজিৎ দৈত্যকে হত্যা করে এবং রাজার মেয়েকে বিয়ে করে। ফিরবার পথে সে তাকে নিয়ে যাবে বলে রাজপুত্র কাঞ্চনপুরের দিকে যাত্রা করলো। পথে রাজকুমার এক দৈত্যকে হত্যা করার সময় সে দৈত্য প্রাণ ভিক্ষা চাইলো এবং কুমার তাকে মুক্ত করে দিল। দৈত্য রাজকুমারকে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দিল। তারই সাহায্যে রাজকুমার কাঞ্চনপুর পৌঁছল এবং মৃগাবতী লাভে সমর্থ হলো। ইন্দ্রের অনুমতি নিয়ে রাজকুমার মৃগাবতীকে নিয়ে আকাশ পথে দেশে ফিরে এল। পথে রাজকুমার তার অপর বিবাহিতা স্ত্রী রাজকন্যাকে সঙ্গে নিয়ে স্বদেশে ফিরলো।

মেঘরাজের কাহিনীর সঙ্গে কুতবনের কাহিনীর কিঞ্চিৎ পার্থক্য আছে। তাতে মনে হয় উভয়ের কাব্যের উৎস এক নয়। কোন সমালোচক অনুমান করেন যে অপভ্রংশে রচিত কোন কাব্য থেকে মেঘরাজ কাহিনীটি সংগ্রহ করেছিলেন। মেঘরাজের 'মৃগাবতী'র রচনাকাল হচ্ছে ১৭২৬ সংবৎ।

বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস অনুসন্ধান করলে দেখা যায় বাঙলায় অন্ততঃ ছয়জন কবি মৃগাবতীর কাহিনী নিয়ে কাব্য রচনা করেছিলেন। এরা হলেন দ্বিজ পশুপতি, দ্বিজ রাম, মুহম্মদ খাতের, করমউল্লা, এবাদতউল্লা, এবং মুহম্মদ মুকীম।[১০] এর মধ্যে দ্বিজ রাম বা রাম দ্বিজ আসামী ভাষার লেখক ছিলেন। দ্বিজ রামের কাহিনীটি নিম্নরূপ :[১১]

কন্দলীনগরের রাজপুত্র এক সরোবরে চারজন পরীকে স্নানরত দেখতে পান। পরীদের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠার প্রতি রাজপুত্র প্রেমাসক্ত হন। অল্পক্ষণ পরেই পরীরা উড়ে চলে যায়। ফলে রাজপুত্র মনমরা হয়ে পড়েন। সৌভাগ্যক্রমে অল্প কয়দিন পরেই ঐ চার পরী আবার স্নান করতে আসে। এবার কৌশলে রাজপুত্র কনিষ্ঠা পরীটিকে আটকে রাখেন। তারা দুজনে সরোবর তীরে এক প্রমোদভবনে আমোদ আহলাদে কিছুদিন অতিবাহিত করে। একদিন ঘটনাক্রমে রাজপুত্র কোন কাজে বাইরে গেলে পরী পালিয়ে যায়। যাবার সময় অবশ্য সে দাসীকে তার ঠিকানা দিয়ে যায়। ঘরে ফিরে পরী চলে গেছে দেখে রাজপুত্র অত্যন্ত বিমর্ষ হয়ে পড়েন। ঐ পরীর অনুসন্ধানে রাজপুত্র নানাদেশ ভ্রমণ করতে থাকেন। অবশেষে রাজপুত্র 'রুকেম' শহরে এসে উপস্থিত হলো। পরীর সখীরা তখন রাজপুত্রের সঙ্গে পরীর বিয়ের আয়োজন করে। যথেষ্ট আড়ম্বরের সঙ্গে বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়।

দ্বিজ পশুপতি কর্তৃক রচিত মৃগাবতীর গল্পও অনুরূপ। এ গল্পে রাজ্যের নাম কণক-নগর। রাজার নাম অশ্বকেতু, যুবরাজের নাম বিশ্বকেতু। রত্নপুরের রাজা চন্দ্রসেনের কন্যা চন্দ্রাবতী স্বর্গরাজ ইন্দ্র কর্তৃক অভিশপ্ত হয়েছিল। অভিশাপের ফলে চন্দ্রাবতীকে 'মৃগ'রূপ ধারণ করতে হয়। বার বৎসর পরে সে অভিশাপ মুক্ত হবে এমন কথা ছিল। গভীর অরণ্যে শিকারের সময় বিশ্বকেতু চন্দ্রাবতীকে দেখতে পায়। অনেক কষ্ট ও সংগ্রামের পর বিশ্বকেতু চন্দ্রাবতী লাভে, সমর্থ হয়। চন্দ্রপুরের সঙ্গে বিশ্বকেতু চিত্রমালাকে বিবাহ করে।[১২] দ্বিজ পশুপতির কাব্যের নাম 'চন্দ্রাবলী'।

মুহম্মদ খাতেরের 'মৃগাবতী' কাহিনীর নাম 'মৃগাবতী-যামিনীভান'।[১৩] রাজপুত্রের নাম যামিনীভান। সেই অনুযায়ী পুথির নাম। সপ্তদশ শতকের কবি ভবানন্দ হরিবংশে মৃগবতীর যে উপাখ্যান বর্ণনা করেছেন তা নিম্নরূপ :[১৪]

মৃগাবতী ছিল ইন্দ্রের বিদ্যাধরী। সে মৃগারূপ ধরে স্নান করতে আসে। সেখানে রাজা রূপবান মৃগরূপী মৃগাবতীকে দেখে আকুল হয়। এক সন্ন্যাসী তাকে বলে যে আবার যখন বিদ্যাধরী নদীতে জলকেলি করতে আসবে তখন যেন রাজা তার বস্ত্র লুকিয়ে রাখে। পরদিন সত্যি সত্যি মৃগাবতী অপ্সরীদের সঙ্গে নদীতে বিবস্ত্র হয়ে জলকেলি করতে থাকে। রাজা রূপবান এই অবসরে কাপড় লুকিয়ে রাখে। মৃগাবতীর বস্ত্র সে এক শর্তে ফেরৎ দিতে রাজি হলো—যে সে তাকে স্বামীত্বে বরণ করবে। মৃগাবতী তাতে রাজি হলো। কিন্তু মৃগাবতীও একটি শর্ত আরোপ করলো যে এক বৎসর রাজা মৃগা-বতীকে স্পর্শ করতে পারবেনা। রাজা নদী তীরে এক অট্টালিকা তৈরী করে সেখানে বসবাস করতে থাকে। এদিকে রাজমন্ত্রী রাজার অভাবে দেশে গোলযোগের আশঙ্কা করে রাজাকে মিথ্যা সংবাদ দিল যে রাজমাতার অসুখ। রাজা দেশে ফিরে গেলেন এই অবসরে ধাত্রীকে ফাঁকি দিয়ে মৃগাবতীও পালিয়ে গেল। রাজা দেশে ফিরে গিয়ে দেখে মায়ের অসুস্থতার সংবাদ সঠিক নহে। তখন রাজা ফিরে আসে নদীতীরের সেই অট্টালিকায়। মৃগাবতীকে দেখতে না পেয়ে রাজা অস্থির হয়ে পড়ে। মৃগাবতীর খোঁজে সে নানা দেশে ঘুরতে ফিরতে থাকে। পরে এক দেশে গিয়ে শুনল যে, সে দেশ রাক্ষসের অধীন। সে রাক্ষস প্রতিদিন একজন মানুষ খায়। ঐ দিন এক ব্রাহ্মণীর এক মাত্র পুত্রের পালা। রাজা ব্রাহ্মণীকে সান্ত্বনা দিয়ে স্বয়ং রাক্ষসের কাছে উপস্থিত হয়। সেখানে নারায়ণের কৃপায় সে রাক্ষসকে বধ করে। বিষ্ণুদূত তখন রাজাকে ইন্দ্রের সভায় নিয়ে যায়। সেখানে রাজা মৃগাবতীকে দেখতে পায়। রাজা মৃগাবতীকে ইন্দ্রের কাছ থেকে চেয়ে নেয়। তারপর মৃগাবতীকে নিয়ে রাজা স্বদেশে ফিরে সুখে শান্তিতে জীবন কাটায়।

মৃগাবতী উপাখ্যানের সঙ্গে বৈদিক পুরুরবা—উর্বশীর কাহিনীর সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়।

সিলেটের কবি খলিল মৃগাবতীর অনুকরণে 'চন্দ্রমুখী' কাব্য রচনা করেন। মুহম্মদ মুকীমের গ্রন্থেও উল্লেখ আছে যে তিনি 'মৃগাবতী' নামে একটি কাব্য লিখেছিলেন :

মৃগাবতী নামে আর পরীর নন্দিনী
মিত্রজনে শুনে সেই অপূর্ব কাহিনী ॥
মোরে আজ্ঞা দিল পীর রচিতে পয়ার।
দেশীভাষে বঙ্গ কথা লোকে বুঝিবার।[১৫]

কবি ফাইয সপ্তদশ শতকে (১৬৮৩) রিজওয়ান শাহা ও রুহ আফজা নামে একটি কাব্য রচনা করেন।[১৬] গল্পটি এরূপ : চীনের রাজকুমার রিজওয়ান শাহ শিকারে গিয়ে একটি হরিণীকে দেখে তার পশ্চাদধাবন করে। হরিণী এক হ্রদে ডুব দিয়ে অন্তর্হিত হয়। রাজা সেই হ্রদের তীরে প্রাসাদ তৈরী করে ঐ হরিণীর জন্য অপেক্ষা করতে থাকে। ঐ হরিণী ছিল 'আফজাপরী'। অনেক দুঃখ কষ্টের পর রাজা সেই পরীকে লাভ করেন। মোটামুটি ভাবে দেখতে গেলে মৃগাবতীর কাহিনীর সঙ্গে এ কাহিনীরও সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়।

শামসের আলী নামে চট্টগ্রামের এক কবিও 'রিজওয়ান শাহা কাব্য' রচনা করেন। সম্ভবতঃ অষ্টাদশ শতকের শেষভাগ এর রচনা কাল।

আমাদের আলোচ্য পুথিটি মৃগাবতী কাহিনী নিয়ে রচিত। কবি করমুল্লার নিবাস ছিল চট্টগ্রাম জিলার সীতাকুণ্ড থানার মুরাদপুর গ্রাম।

কবির ভাষায় লিখা যাক:

প্রণমিএ পিতা জেষ্ঠ কনিষ্ঠ সহোদর
মাতামহ আদি যত হই দণ্ডবত
ভক্তি ভাবএ নাম করিএ শতে শত
তুল্য সকল যত বন্দিএ চরণ
প্রণমিএ ইষ্টমিত্র যত মহাজন
গুণিগণ পদ পুনি ভগতি (ভক্তি) করিয়া
কহিমু কতেক পদ পত্র আর রচিয়া।
চট্টগ্রাম রায্য (রাজ্য) জান অতি দিব্যস্তান
তার মাঝে নেজামপুর চাকলা প্রধান
তাহার দখিন ভাগে আছে এক গ্রাম
মুরাদপুর বুলিআ প্রচণ্ড তার নাম।
তাহার সমুপা সা গিরি অতি উঞ্চ (উচচ) তার
চট্টগ্রামে গিরি নাহি তাহার সমস্বর।
হিন্দু আন আদি যত বলে সিতাকুণ্ড
তথা তীর্থ করি পাএ তথাতে বৈকুণ্ঠ
উনকুটি তির্থ তথা আছএ প্রধান
তীর্থ করে নানা দেশী আসি হিন্দুস্তান।
সেই গিরি পশ্চিমেতে সমুদ্র পূর্বে
মৈদ্ধখানে এ মুরাদপুর জান সবে
সেখ গ্রাম মৈদ্ধে জান সবান উপর

[মৃগাবতী পুথির ৩য় পাতার অপর দিক]

সেই গ্রামে মুহম্মদ বাকের নামে একজন প্রসিদ্ধ তালুকদার ছিলেন। মুহম্মদ বাকের এর এক শিষ্যের পুত্র হচ্ছেন করমউল্লা। কবি তার পিতার নামের উল্লেখ করেন নি। তবে পিতার গুণের বর্ণনা দিয়েছেন:

সর্বগুণে বিশারদ রূপে অবধূত
এক ২ পুত্র তান ভুবন বিজএ
জ্ঞান ধ্যান শাস্ত্র কোন মতে কমি নএ
মহম্মদ বাকর তানক জেষ্ঠ তনয়
সর্বজন গুরু তাক্সি জ্ঞানের আলয়
গ্রামবাসি শিষ্য প্রধান
সে সকল স্থানে সাজিয়াছে জ্ঞান
এক ২ শিস্য তান জ্ঞানের সাগর
তথা থাকএ শ্রেষ্ঠ সবার উপর
তাহান তনয় মুঞি ক্ষুদ্র জ্ঞান মতি
সেই মুরাদপুর মৈদ্ধে মোহর বসতি।
এবে কহি শুন সবে মনের মানস
যেই রূপে গ্রহণ করিলুম কাব্যরস
শ্রীযুত রমজালি ছিল মোর গুরু
রূপে আদিত্য জিনি জ্ঞানে কন্দর্প তরু।

[মৃগাবতী পুথির ৪র্থ পাতা]

কবিগুরু ছিলেন শ্রী রমজালি। তারই আদেশে করমউল্লাহ মৃগাবতী কাব্য রচনা করেন :

প্রণামিয়া ডাণ্ডাইলুম জুড়ি করপুট
কহ গুরু মহাশয় সব প্রবচন
খুদ্র জ্ঞান শিস্য আমি ডাক কি কারণ
আমাপ্রতি সম্বোধি বুলিল
এ কিতাব বাঙ্গলা করিতে আজ্ঞা দিল
বুলিল ফারসী কেহ না পারে পড়িতে।
পত্র আর প্রবন্ধ কহ সকলে বুঝিতে
আদেশ শুনিয়া রিদ্রে (হৃদয়ে) জন্মিলেক ভয়
কহিতে লাগিলুম শুন গুরু মহাশয়
ফারসি কিতাব অল্প আছএ যে অভ্যাস
কোনরূপে করি বাঙ্গলা রিদ্রে লাগে ত্রাস
তা শুনিয়া গুরু মোরে বুলিল হাসিয়া
তথাপিহ এ কিতাব করহ রচন।

[৫ম পাতার অপর দিক]

হস্তে-তুলি দিল মোর বিছমিল্লা বলিয়া
প্রণামিয়া কিতাব লইলুম নিজ কর
ভক্তিভাবে কহিতে লাগিলুম ধীরে ধীরে
আশীর্বাদ করো মোক গুরু মহাশয়
সঙ্কট তরিএ জেন তোমার কৃপায়
তোমার চরণ বিনে গতি নাহি আর
তোমা আখেরে কৈলুম
শুনি আশীর্বাদ গুরু কৈল পুনর্বার
ঈশ্বর কৃপায় তোমা করিব উদ্ধার
প্রভূ সরি(স্বরি) গুরু বলেন করিয়া ব্যাজ
সরস্বতি কল্পী কিচ্ছা করিলুম আগজ
সে সব লিখিলে হএ পুস্তক বিস্তর
শ্রীযুক্ত রমজালি গুরু রসের সাগর
ভাবে ভক্ত দানে মানে যেন পুরন্দর
মৃগমদ দৌবের জিনিয়া যশকৃতি
ধর্মবন্ত জ্ঞানবন্ত মহৎ সন্ততি
তান পদ রেণু চৌক্ষে আঞ্জন করিয়া
হিন করমল্যা কহে পয়ার রচিয়া ।।

[পাতা ৭]

কবি কাহিনীর রাজ্যটির বর্ণনা দিচ্ছেন এ ভাবে :

পশ্চিমেতে এক রাজ্য বানার সহর নাম ।।[১৭]
ভুবনেতে রাজ্য নাহি তাহান উপাম ।।
অতি দিব্যস্থান যেন গন্ধর্ব নগর ——।
উচ্চ নীচ নাহি তাহে দেখিতে সুন্দর ।।

রাজ্য মৈদ্ধে আছে যত প্রজার আলয়।
শুদ্ধ সভা সব নির্মিয়া ছত্র।।
মৈদ্ধ খানে নৃপগৃহ অতি সুবাসিত।
... ...
তার মৈদ্ধে স্থাপতি নৃপতি সিংহাসন (সিঙ্গাসন)।
যতি সুবাসিত সব জড়ি রতন।।
তথা যদি আসন করিল রাজ্যেস্বর।
মধুকর শোভে যেন নলিনী উপর।।
নৃপতির সভা যেন অধিক শোভিত।
জেহেন ইন্দ্রের সভা জগৎ বিদিত।।
মহা ২ মন্ত্রিগণ ৈসে চতুর্ভিত।
নৃপতি মোণ্ডল জেন কুমুদ উদিত।।
কোটি কোটি সৈন্য সব আছে নৃপ দ্বারে।
নানারঙের বাদিতু বাছএ অনির্বার
সারি ২ এরাকি আছএ অশ্বগণ।
আরোহণ হৈলে এ পবন বাহন।।

[পাতা ৭]

রাজার সিংহাসন, রাজার সভাগৃহ প্রভৃতির দীর্ঘ বর্ণনা আছে পুথির প্রথম দিকে। রাজার গুণের বর্ণনা আছে কয়েক পাতা ব্যাপী। রাজার পুত্র সন্তান হলে রাজা অনেক দান দক্ষিণা করেন। পণ্ডিত জ্যোতিষী সবাইকে তিনি ডাকলেন। সবাই রাজপুত্রের প্রশংসা করলেন। সে রূপে গুণে দানে ধর্মে অদ্বিতীয় হবে। কিন্তু পরীর সঙ্গে প্রেম করে তাকে অনেক কষ্ট ভোগ করতে হবে।

কালক্রমে মহাদেবী হৈল গর্ভবতী
দেবী গর্ভবতী—দেখি নৃপ উল্লসিত।
ক্রমে ২ দিন মাস হইল উপস্থিত।।
শুভক্ষণে মহাদেবী পুত্র প্রসবিল
সুবর্ণ প্রতিমা যেন মাণিক্য শোভিত।
সুকুমার পুত্র প্রসবিল কুল যশি।
গৃহের অন্তরে যেন উগিলেক শশি।।
আকাশ মণ্ডল জারি জেহেন আদিত্য।
নৃপতির গৃহে আসি হইল উদিত।।
সুবর্ণের সিংহাসনে বসিছে রাজন।
পাত্র মিত্র সঙ্গী করি মন।।
হেনকালে এক দূত সত্বরে আসিয়া।
কর জোরে ডাণ্ডাইল নৃপ প্রণমিয়া।।
বলে অবধান কর নৃপ গুণ বান।।
বিধি পুরাইল তোমা মানস কল্যাণ।।
... ...
ভুবন মোহন রূপ রসের নাগর।।
রাশি ক্রেমে ফলাফল দীর্ঘ আয়ু অতি।
সর্ব যে কুশল দেখি তোমার সন্ততি।।

কিন্তু অল্প অকুশল দেখি রাখি, ক্রেম।
ভ্রমক হইব পারি সঙ্গে করি প্রেম।।
প্রেমানলে জুড়ি অঙ্গ প্রাণি হৈব শেষ।
জলস্থল বিপস্থে ভ্রমের নানাদেশ।।
আকাশ ভ্রমএ যেন চন্দ্র দিবাকর।
তেনমতে ভ্রমিবেক তুমার কুয়র।।
... ...
বিজয় করিয়া স্থর যাইব চলিয়া।
যথা আছে আপনার বাঞ্ছা উদ্দেশিয়া।।
রাশিক্রমে দুই কন্যা করিব গ্রহণ।
পুণি আপনার দেশে করিব গমন।।
তা শুনিয়া নৃপতি হৈল বিষাদিত।
পাত্র সবে বলে শুন আর রাজ্যেশ্বর।
কি কারণে দুখ তুমি ভাব মনান্তর।
রাখহ কুমার নাম জামিনী বাহান
তা শুনিয়া আনন্দিত হইল নর ডণ্ড
জামিনি বাহান নাম রাখিল প্রচণ্ড
তবে মন্ত্র সব ডাকি বোলে মোহাশয়

[পাতা ১০,১২,১৪]

কুমার বড় হয়ে বড় হয়ে দুই কন্যাকে বিয়ে করবে। এ সব ভবিষ্যৎ বাণী রাজা শুনলো। রাজপুত্র যামিনীভান বড় হয়ে শিকারে যায়। সেখানে 'মৃগ' রূপী মৃগাবতীর সাক্ষাৎ পায় :

চলিল কুমার বাপ প্রণাম করিয়া।
এরাকি বাহন পরে হই আরোহণ।
চলিল কুমার মনি কৃতান্ত সমান।।
চাবুক মারিআ অশ্ব চালাইল বেগে।
চলিলেন আশ্বরাজ পবনের আগে।।
একত এরাকি ঘোড়া চাবুকের ঘাএ
কুপিত অন্তরে চলে মৃগরাজ পাএ।
সর্বসৈন্য কুমারের চলে চতুর্ভিত।
চন্দ্রিমালয় যেন ই সহিত
সুরপতি চলে যেন স্থরগণ সঙ্গে।
তেনমতে কুমার চলিল মনরঙ্গে।।
সর্বসৈন্য সঙ্গে কবি জামিনী বাহান
কাননে প্রবেশিল মৃগ হেরে মনে[২]
... ...
এহি মতে মৃগাবতী মৃগ রূপ ধরি।
কুমারকে পঞ্চবান হানিল কুমারি।।
সেই ঘাএ কুমারের প্রাণ হরি নিল।
ধৈর্যবসে অশ্ব পরে থকিত রহিল।

সৈন্য সম্বোধিয়া বোলে মোহামতি।
চতুর্দিগে বেরি মৃগ ধর শিঘ্রগতি।
এহি মৃগ দেখি মুই হৈলু চঞ্চকার
নয়ানে না দেখি পন্থ লাগে আঁধিয়ার।
প্রলয়ের কালে যেন ভ্রমএ জগত
ধর্মকায় হৈব চক্ষে না দেখিব পথ(পত)
মৃগ দেখি হৈল মোর তেহেন আকার।
কুম্ভালের চক্র জেন ভ্রমে আনিবার।
যেই জনে এহি মৃগ ধরে সঞ্জীবন
সন্তোষ করিমু তারে দিয়া রত্নধন।

[১৫ পাতার অপর দিক]

রাজকুমারের অনেক কষ্ট লাঞ্চনা ভোগের বিবরণ আছে পুথিতে। মৃগাবতীর খোঁজ করতে গিয়ে পথে 'রুকমিনী' নামে আর এক কন্যাকেও বিবাহ করে রাজকুমার।

এবে শুন গুণিগণ:
রুকমিনী বিবরণ
যেন মতে বিলাপ কর
জদি অস্ত গেল সুর
সৈন্ধ্যা হৈলো ঘোরতর
কন্যা এ পন্থ নিরিক্ষি রহিল
সামডণ্ড নিশি বেল
কোতয়াল নিস্বরিল
নিশিভাগে চাহি ফিরিবার
তথাপি হ যুবরাজ
না আসিল পুরিমাঝ—
নির্ণয় করিতে নারে তার
কতক্ষণে মোর সুর
প্রবেশিব অন্তঃপুর।

[৭৩ পাতা]

রুকমিনীকে বিবাহ করে রাজকুমার আবার মৃগাবতীর খোঁজে বেরিয়ে পড়ে। রাজকুমারের বিরহে রুকমিনী অতিকষ্টে দিন যামিনী যাপন করে। শেষপর্যন্ত রাজকুমার কাঞ্চন নগর পর্যন্ত ধাওয়া করে:

তথাতে কুমার ভ্রমি দেশ দেশান্তর।
উপস্থিত হইল গিয়া কাঞ্চন নগর।।
কাঞ্চন সহর বুলি না জানে কুমার।
আন রাজ্য বলিয়া ভাবিল মনান্তর।।
.. ..
মানবেত জন্ম মোর বানারস স্থিতি।
জামিনী বাহান নাম জগত সন্ততি।।
পারপা বিপিনে রৈক্ষা কৈল করতার।
যেরূপে এথাতে আইলুম স্মুন সমাচার।।

একদিন গেলুম বনে আখেট করিতে।
আচায্য (আশ্চর্য্য) অপূর্ব এক দেখিলুম তাহাতে।।
অষ্ট অলংকার পরি কুমুদ বাহন।
সম্মুখে আসিয়া মোর দিল দরশন।।
খেনক মোহিনী কন্য খেনে মৃগ রূপ
খেনে হিদ্রে হানি বানি খেনেক আলোপ।
তা দেখিয়া সৈন্য প্রতি করিলুম আদেশ।
চতুর্দিস বেরি মৃগ ধরিতে বিশেষ।।
রাখিতে নারি মৃগ ধাইল তুরিত।
এক পুষ্করিণিতে জদি হইল লুকিত।।
সৈন্য সঙ্গে এথা গিয়া লাগ না আটয়া
ঋতু (রিত্তু) মাস রৈলুম তথা গৃহ আরম্ভিয়া।
বিমর্ষি বুঝিলুম সেই মৃগ নহে পরী।
ছলিবার আইল মোক মৃগ রূপ ধরি।
পুনি ঋতু মাস যদি রহিল সত্তর।
স্নান করিবার কন্যা আইল পুনর্বার।।

[৮৭ পাতা]

বহু কষ্ট-তিক্ত অভিজ্ঞতার পর রাজকুমার 'মৃগাবতী'র সাক্ষাৎ পায়। নৌপথে রাজার কুমার বিপদে পতিত হয়। তার নৌকা ডুবে যায় এবং হাঙ্গর কুমীরের সঙ্গে তাকে লড়াই করতে হয়। শেষ পর্যন্ত মৃগাবতী লাভে সমর্থ হয়।

বুহিত্র মাগিলুম কন্যা বিচার করিতে।
ধনে জনে সপ্তডিঙ্গা করি আগুসার।।
সপ্ত মন্ত্রি তার মাঝে দিল মহারাজ।।
এক অব্দ পন্থ বাহি পেলুম মনরঙ্গে
কুগ্রহ লাগি ডিঙ্গা ভাঙ্গিল তরঙ্গে।
ধনে জনে সামাস্ত হইয়া গেল তল।
পাট লক্ষএ খেনী ভাসিলুম সিন্ধু জল।
তাহাতে হাঙ্গর মীন উঠি ডুব মনে।
বক্ষ হতে মাংস মোর করিল ভক্ষণ।
বিধাতা রক্ষিতা আছে কে মারিতে পারে
আর দিন পটে গিয়া লাগিল কিনার
রাজ সম্পটে যদি হৈল অটনীতল
নয়ান প্রকাশি গিরি দেখিলুম
ইচ্ছা হৈল সে গিরিতে উঠিতে তখন।
নানা ফলকুল ভক্ষি রাখিতে জীবন।
উপবাসে হাটিতে না পারি কাম্পে অঙ্গ।
বিশেষ মারিছে ছাট সিন্ধুর তরঙ্গ
জানুএ হাটিয়া গিরি শিখরে উঠিলুম
ফলফুল ভক্ষি মাত্র কিছু শান্ত হৈলুম
চির দিনে দেখা তাহে রাক্ষসের সনে
ভক্ষিবারে আমায় চাহিল দুরাচার
তার সঙ্গে যুদ্ধ দিলুম সবি করতার

নিশিদিশি সংগ্রাম আছিল পরাস্পর।
জয় পরাজয় নাহি দোহা সম সম্বর
অনেক প্রকারে তাকে করিয়া নিধন
তথা হন্তে শীঘ্র গতি করিলুম গমন।

[৮৮ পাতা]

উপমা রূপকের প্রয়োগে করমউল্লার কাব্য নিঃসন্দেহে মধ্যযুগের শেষভাগের কাব্য-গুলির মধ্যে উল্লেখ যোগ্য। কবিত্ব শক্তির প্রকাশ ঘটেছে এই কাব্যখানির বহু স্থলে। দু'একটি উদাহরণ দেওয়া যায় :

রাজযোগ্য সুবসন আনি শীঘ্রগতি।
নিজহস্তে পরাইল কন্যা মৃগাবতী।।
তা দেখিয়া কুমার হইল আনন্দিত।
দরিদ্রে পাইল যেন ধনের ভাণ্ডার।
নিদাঘ সময় যেন বিষ্টি অনিবার।।
তেহেন কুমার পাই কুমারীর দর্শন।
মৃত ঘট মধ্যে জীব হৈল সঞ্চরণ।।
অবশেষে দোহে মিলি পালঙ্কে বসিল।

[৯১ পাতা]

অন্যত্র জ্ঞানের কথাও আছে :

কুমারীর বাক্য যদি হৈল নিবারণ—
মৃদু ২ হাসি কহে নৃপতি নন্দন।
কুমার বোলেন্ত শুন নৃপতি নন্দিনি।
যতেক কহিলা বাক্য সব বত্ত্ব জানি।
হেন শুদ্ধ সুপণ্ডিত নাহি কোন জন।
পাপপুণ্য ভালমন্দ আছে ত্রিভুবন।
যে মক্কা মদিনা গেলে পাপ বিমচএ।
সেই মক্কা মদিনাতে আছে পাপীগণ।
যেই গঙ্গা গয়া তীর্থে পাপ দিগন্তের।
সেই গয়া গঙ্গাতে আছে ধর্মহীন নর।।

[৯২ পাতা]

অষ্টাদশ শতকের মুসলিম কবি কর্তৃক রচিত হলেও এ কাব্যে—আরবী ফার্সী শব্দের প্রয়োগ অতি সীমাবদ্ধ। তৎসম শব্দের প্রয়োগে আর পয়ার ত্রিপদী ছন্দের সুপ্রয়োগে করমউল্লা মধ্যযুগের কবিদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য বলা চলে।

তথ্যনির্দেশ

১ মুহম্মদ এনামুল হক : মুসলিম বাঙ্গালা সাহিত্য, ১৯৫৭, ঢাকা, পৃ. ২৮৭
২ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ : বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা, দ্বিতীয় খণ্ড, ১৩৭১, ঢাকা, পৃ. ৩৬২

৩ বাংলা একাডেমী পত্রিকা, ঢাকা, ১৩৬৬, প্রথম খণ্ড, পৃ. ২২। দ্রষ্টব্য : বাংলা রোমাণ্টিক কাব্যের হিন্দী অবধী পটভূমি : মমতাজুর রহমান তরফদার।

৪ সুকুমার সেন : ইসলামী বাঙ্গালা সাহিত্য, বর্ধমান, ১৯৫৮, পৃ. ৪০

৫ বিহার রিসার্চ সোসাইটি, ১৯৫৫, হাসান আশকারীর প্রবন্ধ : দ্রষ্টব্য বা. এ. পত্রিকা ১৩৬১

৬ বাংলা একাডেমী পত্রিকা, ১৩৬৬, প্রথম খণ্ড, পৃ. ২১

৭ প্রাগুক্ত, পৃ. ২০

৮ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭, 'রাজকুমার গেল কাঞ্চণপুর
মৃগাবতী •••সে হলো যোগী।'

৯ ভাষা সাহিত্য পত্র, জাহাঙ্গীরনগর, ঢাকা ষষ্ঠ বর্ষ, ১৩৮৫, পৃ. ৮৫
সৈয়দ আলী আহসান : কুতবন-কৃত প্রেমকাব্য মৃগাবতী।

১০ মুহম্মদ এনামুল হক : প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৭

১১ বিরিঞ্চিকুমার বড়ুয়া : History of Assamese Literature, Delhi, 1968 p. 93-94.

১২ সুকুমার সেন : প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪-৩৯

১৩ প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০। মোহাম্মদ খাতেরের সঙ্গে করমউল্লার পুথির সাদৃশ্য রয়েছে, রাজকুমারের নামে।

১৪ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ : প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬২

১৫ মুহম্মদ এনামুল হক : প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৬

১৬ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ : প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯২